পঞ্চম অধ্যায়

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট পর্যায়টি সম্পূর্ণভাবে ক্ষেত্রসমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্যাবলীর ভিত্তিতে রচিত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের পটুয়ারা একাধিক জেলায় ছড়িয়ে রয়েছেন , তথাপি এঁদের খুঁজে নিতে বর্তমান গবেষকের তেমন কোন অসুবিধা হয়নি। তথ্য সংগ্রহে প্রাথমিক অসুবিধা হয়েছে ঠিকই ; কিন্তু যত দিন গেছে , পটুয়াদের সঙ্গে বর্তমান গবেষকের সম্পর্ক তত গাঢ় হয়েছে - নিবিড় হয়েছে । পটুয়ারা তাদের অমূল্য সময় যেভাবে দিনের পর দিন এই গবেষকের জন্য ব্যয় করেছে তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ । যেভাবে পটুয়াদের কাছ থেকে আতিথেয়তা পেয়েছি তা কোনদিন ভোলবার নয়। সে ইতিহাসের কথা অন্তরে রেখে পরিশিষ্ট পর্যায়ের আলোচনায় অগ্রসর হতে পারি ।

পটুয়ারা কৌম জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভূক্ত হওয়ায় বৈবাহিক সম্পর্কে যেমন , তেমনি সামাজিক আচার অনুষ্ঠানও সাধারণত নিজেদের গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেন। তদুপরি এঁদের প্রধান জীবিকা পট লিখা ও প্রদর্শনার্থেপট নিয়ে গ্রামে - গ্রামে ঘোরা হওয়ায় , একটি গোষ্ঠীর পটুয়া অন্য গোষ্ঠীর পটুয়াদের অবস্থানের খোঁজ খবর সহজেই দিতে পারেন। স্বভাবতই পটুয়া অঞ্চল খুঁজে বের করতে বর্তমান গবেষকের কোন অসুবিধে হয়নি। এমনকি যে সমস্ত পটুয়া পট কেন্দ্রিক জীবিকা ছেড়ে অন্য পেশায় নিযুক্ত হয়েছেন তাদের কথাও জানা যায় এই পটুয়াদের মুখে। এর জন্য বিশেষ কোনো প্রচেষ্টার প্রয়োজন নেই । পটুয়া নিজেদের অবস্থান সুচিহ্নিত করতে, পটকেন্দ্রিক ভালোবাসার কথা বলতে গিয়ে উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবেই তা শুনিয়ে দেন ।

হাওড়া , দক্ষিণ ২৪ পরগণা কিংবা মুর্শিদাবাদ-এর আর কোনো পটুয়া এখন পট আঁকেন না । আজও যে সমস্ত পটুয়া পট আঁকেন তাঁরা মূলত পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর , বাঁকুড়া , পুরুলিয়া , ও বীরভূমে বসবাস করেন । তবে পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরে পট লিখা ও পট প্রদর্শনের সঙ্গে যুক্ত পটুয়ার সংখ্যাই পশ্চিমবঙ্গে সর্বাধিক । এঁদের একাংশ পৌরাণিক পট রচনায় যেমন দক্ষ তেমনি একাংশ সামাজিক পট রচনাতেও সুদক্ষ। কোন কোন পটুয়া পট লিখতে বিশেষ পারদর্শী । আবার কোনো কোনো পটুয়া পটসংগীত পরিবেশনে নজর কাড়েন। তবে কেবলমাত্র মেদিনীপুরে মহিলা পটুয়াদের অন্তর্ভূক্তি ঘটেছে ; এঁদের মধ্যে মেদিনীপুরের নয়াগ্রামে রাণী চিত্রকর, যমুনা চিত্রকরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। উভয়েই সুকণ্ঠের অধিকারী। রাণী আবার বিদেশ ভ্রমণ করে এসেছেন । শুধুমাত্র নয়াগ্রাম নয় , নন্দীগ্রাম থানার হবিচক , নানকারচক কিংবা দাসপুর থানার নির্ভয়পুর , নাড়াজোল - এর মহিলা পটুয়ারা শুধুমাত্র পটসংগীত পরিবেশন করেন না; পটচিত্র লিখাতেও সুদক্ষ হয়ে উঠ্ছেন। ক্ষেত্রগবেষণা লব্ধ তথ্য অনুযায়ী জানা যায় , পুরুষের তুলনায় মহিলা পটুয়াদের সংখ্যা মেদিনীপুরে বৃদ্ধি পেয়েছে। পুরুষের তুলনায় জড়ানো পটের সুদীর্ঘ গান গুলিও মহিলা পটুয়ারা অবলীলাক্রমে পরিবেশন করেন। মহিলা পটুয়াদের আর্থসামাজিক অগ্রগতি পটের আদিম উৎসকে সুস্পষ্ট করে।

এই অধ্যায়ে পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরের শ্রেষ্ঠ ছয়জন পটুয়া ও তাঁদের পরিবারের চিত্র এবং পট পটুয়ার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাঁদের ব্যক্তিগত মতামত তুলে ধরা হল।

কতিপয় বিশিষ্ট পট-শিল্পীর জীবনী

অজিত চিত্রকর

১৯৯৯ সালের ১লা আগষ্ট ক্ষেত্রসমীক্ষার কাজে তৃতীয়বার মেদিনীপুরের ঠেকুয়াচকে যাই। পরপর তিনদিন ঠেকুয়াচকের অজিত চিত্রকরের (৬৫) পাশের বাড়ীতে আমার থাকার ব্যবস্থা হয়। ঠেকুয়াচকের ছয় ঘর পটুয়ার মধ্যে অজিত চিত্রকরের অবস্থাই একটু ভাল । ঠেকুয়াচকের অজিত চিত্রকরই একমাত্র পটুয়া যিনি পটলিখায় যেমন সুদক্ষ , তেমনি পটসংগীত রচনাতেও সিদ্ধহস্ত । এছাড়া ভোলানাথ চিত্রকর (৫৩) অজিত বা ভিন্ন স্থানের কোনো পটুয়ার কাছ থেকে পট কিনে নিয়ে বাড়ি বাড়ি পট প্রদর্শন করে জীবিকা অর্জন করেন । ভোলানাথ চিত্রকরের একটি ছেলে ও একটি মেয়ে । ছেলে অবিজুল চিত্রকর (৩২) পটলিখা কিংবা পটের গান কিছুই জানেন না। বংশ পরম্পরাগত জীবিকায় সে কেন নিযুক্ত নয়- এর উত্তরে অবিজুল জানায় " পট লিখলে পেট চালাবে কে ?" বস্তুত অন্নর দাবীতেই রূপদক্ষ পটুয়ারা যে ভিন্ন জীবিকা নির্বাহ করছেন তার প্রমাণ মেলে অবিজুলের কথাতে। ভোলানাথের মেয়ে জুলেখা (২৫) , স্থানীয় মাধ্যমিক স্কুলে সে সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত পড়েছে । নয়াগ্রামে উসমন চিত্রকরের মধ্যম পুত্র রহমন চিত্রকরের সঙ্গে জুলেখার সাদি হয়েছে । নয়ার রহমন কিন্তু পট লেখে ।

অজিত চিত্রকরের অন্য নাম নেমাজ মিস্ত্রি । স্ত্রী আবিরণ চিত্রকর। পিতা গদাধর চিত্রকরের মুসলমান নাম গুলজার। মা মোহিনী চিত্রকরের আর এক নাম ময়ূরজান। গ্রাম- ঠেকুয়াচক, পোঃ - কুমরচক, জেলা পূর্ব মেদিনীপুরের বাসিন্দা অজিত চিত্রকর ১৪ বছর বয়স থেকে পট ' লিখা' শিক্ষা শুরু করেছেন। প্রথম গুরু ভূষণ চিত্রকর। পটুয়াসংগীত শিখেছেন গুণধর চিত্রকরের কাছে । অজিত চিত্রকরের দাদু রমানাথ চিত্রকর পট লিখতেন , গান গাইতেন এবং ঠাকুর গড়তেন। বছর পনের আগে হিন্দু দেব- দেবীর প্রতিমাও গড়তেন অজিত চিত্রকর। এখন আর প্রতিমা গড়েন না। বয়সের ভারে নুব্জ হলেও এখনও তিনি 'পট লিখেন ' ও গান রচনা করেন । কলকাতার ওয়ার্কশপ বা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হস্ত ও কুটিরশিল্প মেলায় প্রতিবৎসরই নিয়মিতভাবে তাঁকে দেখতে পাওয়া যায়। সারা জীবন ধরে অজিত চিত্রকর 'পট লিখে' চলেছেন। পটুয়ার জীবনকাহিনী নিয়ে রচিত তাঁর গানটি বেশ বড়। গানটি পরিবেশনও করেন তিনি চমৎকারভাবে। পনের - ষোল বৎসর বয়স থেকেই অজিত চিত্রকর গায়ে ফতুয়া ও সাদা কাপড় পরিধান করে গ্রামে গ্রামে পট দেখাতে যেতেন । দৈনিক দশ - বারো টাকা নতুবা কুড়ি কেজির মতো ধান রোজগার করতেন। সাধারণ মানুষও পৌরাণিক পট দেখতে অধিক আগ্রহী ছিলেন । বর্তমানে অজিত চিত্রকর আর গ্রামে যান না আয় উপায় তেমন হয় না বলে। অজিত চিত্রকরের পাঁচটি ছেলে ও তিনটি মেয়ে। বড় ছেলে মধু চিত্রকর স্থানীয় বিদ্যালয়ে দ্বিতীয় শ্রেণী পর্যন্ত পড়েছেন। বর্তমানে নয়াতে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। এর মুসলমান নাম মহম্মদ চিত্রকর। মধু পট আঁকতে এবং গান গাইতে পারেন। বিয়ে করেছেন নানকারচকে। বর্তমানে স্বামী স্ত্রী দুজনে মিলেই কাপড়ের উপর ফেব্রিক দিয়ে পটের ছবি আঁকেন। মধু কলকাতার অদিতি সরকারের কাছ থেকে তসর ও সিল্কের কাপড়ের উপর পট আঁকার বায়না পান । শারদীয়া উৎসব ও অন্যান্য পূজা - উৎসবে মধু পটের ছবি দিয়ে পূজার প্যাণ্ডেল সাজানোরও কাজ পান।

মনতাজের (মেজো ছেলে , অন্য নাম ফেলা চিত্রকর) শিক্ষা ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত । পট একটু - আধটু আঁকতে পারে কিন্তু গান জানে না। মনতাজের মূল রোজগার হয় রিক্সা টেনে। সেজো আলাদিন এখন পট আঁকতে পারে। অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়েছে । অজিত চিত্রকরের অন্যান্য ছেলে মেয়েরাও অল্পবিস্তর পট আঁকা ও পট গান জানে।

অজিত চিত্রকরের বসতবাটি ছাড়া জমিজমা বিশেষ কিছু নেই । পটই তাঁর সম্বল । আর সম্বল বাঁকা বাঁকা অক্ষরে লেখা নিজের পটুয়া জীবনের খণ্ডিত পুঁথি -- যা একদিন না একদিন প্রকাশ হবে বলে তাঁর বাসনা। ইনি জেলাভিত্তিক প্রথম , দ্বিতীয় এবং রাজ্য ভিত্তিক একবার প্রথম পুরস্কার পেয়েছেন। পটের জন্য একবার আই. আর. ডি. পি. লোন পাঁচ হাজার টাকা পেয়েছিলেন । দুবার দিল্লী ও বরদা গিয়েছেন।

পট এবং পটুয়ার ভবিষ্যৎ নিয়ে অজিত চিত্রকরের বক্তব্যের শেষ নেই । তিনি নিজে পটের গানের প্রাচীন সুর অবিকৃত রাখতে আগ্রহী । তবে বর্তমানে বিভিন্ন লোকসংগীত ও আধুনিক গানের সুরে যে পটের গান গাওয়া হচ্ছে তাকেও তিনি স্বাগত জানান । অজিতের এই কথাতেই পটুয়াসংগীতের ঐতিহ্যের স্থির ও পরিবর্তনশীল রূপটিকে নতুন করে উপলব্ধি করতে পারি ।

পটুয়াদের ধর্মান্তরিত হওয়া প্রসঙ্গে অজিতের বক্তব্য-- ' জিজিয়া করের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে তাঁরা মুসলমান হয়েছেন। '' কথান্তরে জাতপাতের কথা ওঠায় তিনি বলেন '১৩৬২ সালে হিন্দু মহাসভার হিড়িক হয় , কিন্তু পটুয়ারা বামুন-টামুনের অসুবিধার কথা ভেবে মুসলমান হয়ে যান। আবার রাজ্য সরকার সরকারী কাজের সুবিধার জন্য সবপটুয়াকেই এক পদবী নেওয়ার কথা বলতেই সব পটুয়াই চিত্রকর পদবী নেন।' অজিত চিত্রকরের আগের পদবী ছিল চাপড়ী । ঠেকুয়াচকের সব পটুয়ারই ছিল চাপড়ী পদবী ।

পুলিন চিত্রকর

মেদিনীপুরের নয়া গ্রামে বসবাসকারী সবচেয়ে বয়স্ক এবং অভিজ্ঞ পটুয়া হলেন পুলিন চিত্রকর ওরফে ইমামুদ্দিন চিত্রকর। মেদিনীপুরে জীবিত পটুয়া যাঁরা এখনো পট আঁকেন তাঁদের মধ্যে সবথেকে শ্রদ্ধেয় শিল্পী পুলিন চিত্রকর। বয়স আনুমানিক সত্তর বৎসর। জন্ম এই জেলারই ঠেকুয়াচক গ্রামে। ১৩৬১ সালে নয়ায় এসে বসতি স্থাপন করেন। পিতা ভূষণ চাপড়ী । মা স্বর্গীয়া ব্রজবালা চাপড়ী। অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন এই পটুয়া আট - নয় বৎসর বয়স থেকেই পট আঁকছেন । বাপ ঠাকুরদার কাছ থেকে আঁকার শিক্ষা পেয়েছেন । পট আঁকা , গান বাঁধা ও তাতে সুর দিয়ে গ্রামে গ্রামে পট প্রদর্শন করে বেড়ানো পুলিনের মূল জীবিকা। মাসে পট দেখিয়ে আয় চারশ টাকার মতো । এছাড়া মাটির পুতুলও তৈরী করেন। পিংলা ও গোবর্দ্ধনপুরের বিশিষ্ট জমিদার বাড়ীতে দুর্গা প্রতিমা তৈরী করতেন । এখন বয়সের ভারে আর পারেন না। তবু বর্ষার সময় ছাড়া প্রায় সারা বৎসরই গ্রাম গ্রামান্তরে পটের গিলিপ কাঁধে নিয়ে পট দেখিয়ে জীবিকানির্বাহ করেন।

নয়াগ্রামে দুটি পাড়া - পূর্বপাড়া ও পশ্চিমপাড়া। এই দুই পাড়ার মধ্যে মাঝে মাঝে বিবাদ লেগে যায়। বিদেশী বা কোনো গবেষক কোনো এক পাড়ায় প্রবেশ করলে সহজে অন্য পাড়ায় যেতে পারেন না। তবে নয়ার পূর্ব পাড়ার এই পুলিন চিত্রকর একটু অন্য রকমের। আপাত ধীর-স্থির , শান্ত প্রকৃতির পুলিন চিত্রকর কিন্তু তার দৃঢ় প্রত্যয় পটশিল্প পুনরুজ্জীবনের। পটশিল্পের প্রতি প্রগাঢ় ভালোবাসা আর আস্থা নিয়ে আজীবন পট এঁকে ও গান গেয়ে চলেছেন। তাঁর সন্তান-সন্ততিরাও প্রত্যেকে পটের উপক নির্ভরশীল। বাবার সুযোগ্য উত্তরাধিকারী বড়ছেলে ননীগোপাল (মহম্মদ - ৫৫) , মেজো আনন্দ (ইয়াকুব - ৪৬) ও ছোটো এবাদত (৪২)। এরা প্রত্যেকেই পট লিখতে ও পটেরগান পরিবেশন করতে সিদ্ধহস্ত। কেননা,

পুলিন চিত্রকরের পিতা ঁ ভূষণ চাপড়ী ও ঠাকুরদা ঁ সদয় চাপড়ী খুব ভালো পট আঁকতেন । সদয়ের আঁকা খণ্ডিত, মলিন প্রায় তিনখানি পৌরাণিক পট এখনো পুলিনের সংগ্রহে রয়েছে। এই পট তিনি বিক্রী করতে নারাজ । পুলিন চিত্রকর ১৯৮৮ ও ৯০ সালে রাজ্য ভিত্তিক কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পাধিকার পঃ বঃ কারুশিল্প প্রতিযোগিতায় পটশিল্পে প্রথম স্থান অর্জন করেছিলেন। বছর কয়েক আগে নতুন প্রজন্মকে পটশিল্প শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে কল্যাণী ট্রাডিশন্যাল আর্ট স্কুল খুলেছিলেন পুত্রদের সহায়তায়। কিন্তু মুলতঃ শিক্ষার্থীর অভাবে এবং রোজগার পাতি না হওয়ায় তা বন্ধ হয়ে গেছে । পুলিন চিত্রকরের বড় ছেলে ননীগোপালের পটের হাত ভাল । ইনিও পটশিল্পের সুবর্ণযুগ প্রত্যাবর্তনে বিশ্বাসী । মেজো আনন্দ বিভিন্ন মেলায় পট বিক্রি করেন। মাসে পাঁচশ টাকা তাঁর গড় আয়। পৌরাণিক পটের মধ্যে কৃষ্ণলীলা , বেহুলালক্ষ্মীন্দর , সাবিত্রী সত্যবান এঁর বড় প্রিয় পট। এছাড়া মনসামঙ্গলেও ইনি স্বচ্ছন্দ । ছোটো ছেলে এবাদতের পটের হাত সবচেয়ে ভাল। তবে বাবা - দাদাদের মত নয় । এবাদতের প্রিয় আধুনিক পট । তাঁর বন্যার পট , বৃক্ষরোপণ , সাক্ষরতার পট বেশী পছন্দ । এছাড়া সীতাহরণ পটটি সুন্দর করে পরিবেশন করেন ।

পুলিন চিত্রকরের এই বৃদ্ধ বয়সে গলার মড্‌লিং দেখলে চমকে উঠতে হয় । তাঁর কণ্ঠে গঙ্গা - যমুনা তর্জা পটগান যে শুনেছে সেই তাঁকে স্মরণে রেখেছে। এছাড়া মনোহর ফাঁসিরার পট , স্বাধীনতার পট , নরমেধ যজ্ঞের পট , ক্ষুদিরামের পট , নিমাই সন্ন্যাস পট তাঁর বড় প্রিয় । জাতপাতের ভেদাভেদকে এঁরা যথেষ্ট ঘৃণা করেন। বছর পনের আগে একবার মৌলবীরা নয়ার পটুয়াদের উপর পট আঁকা বন্ধ করার জন্য চাপ দিয়েছিল , মজলিস্ ও বসেছিল একাধিকবার। কিন্তু পটুয়ারা দৃঢ় হস্তে তা রোধ করেন। পুলিন চিত্রকর সভাস্থলে যে গান গেয়েছিলেন তা এক কিংবদন্তী ঃ

‘ যিনি আঁকিলেন , যিনি গাহিলেন গান
সে আমার দয়ার নবি ,দরুদ বাড় মুসলমান
তুমি যে দয়ার নবি আঁধার ঘরে ছিল সবই
এসে শুনাইলে যে গুণগান
আঁধার হলো আলো , সবাই পেল সম্মান
সব যিনি হিন্দু মুসলমান । আমরাএক মায়ের সন্তান ।’

তাঁর ব্যাখ্যায় ‘ সুন্দরকে দেখায় দোষ কি ? নৃত্য , গীতে দোষ না থাকলে ছবি আঁকা বা দেখায় দোষ থাকবে কেন? হিন্দু মুসলমান আমরা সবাই এক মায়ের সন্তান। ঝগড়া বিবাদ করে কোনো লাভ নেই। ’ এরপর মৌলবীরা আর বাধা দেন নি। এখন পটুয়ারা কোরাণ পড়েন , নামাজে যান। নয়ার পূর্বপাড়ায় পুলিন ও তাঁর তিন ছেলের পরিবার ছাড়াও রয়েছে গঙ্গা মান্নার পরিবার। গঙ্গা জাতিতে মাহিষ্য হলেও গুরু হিসাবে মেনেছেন আনন্দ চিত্রকরকে । পট আঁকেন ও বছর পাঁচেক হল পটের গান শিখে নিয়ে গাইছেন। তবে গঙ্গার বেশী খাতির বিদেশে। কারণ স্বামী তপন মান্নার সহযোগিতায় তসরের কাপড় কিনে নিয়ে এসে সেই কাপড়ে ফেব্রিক রঙ দিয়ে পট আঁকছেন। বিদেশীরা সেই পট কিনেও নিয়ে যাচ্ছেন। গঙ্গা পটে এমনি করেই নতুন জোয়ার আনতে বিশ্বাসী ।

রাণী চিত্রকর ঃ

নয়ার পশ্চিম পাড়ায় পটুয়ার সংখ্যাই অধিক । এ পাড়ায় প্রায় ত্রিশ ঘর পটুয়ার বাস। তার মধ্যে রাণীর কণ্ঠস্বর সবচেয়ে মিষ্টি । স্বামী শ্যামসুন্দর চিত্রকর (৪০) দ্বিতীয় শ্রেণী পর্যন্ত পড়েছেন। ইনি এ পাড়ার জামাই। শ্যামসুন্দর- রাণীর একটিই মেয়ে , নাম সুষমা চিত্রকর (১২) । সুষমা এখন পড়াশুনা করে মালিকগ্রাম হাইস্কুলে। এ ছাড়া সে বাবা-মার কাছে পটআঁকাও শেখে । তার আঁকা কয়েকটি পট বিক্রিও হয়েছে ।

শ্যামসুন্দর ও রাণীর ধ্যান-জ্ঞান-স্বপ্ন এই পট। দীর্ঘ প্রায়কুড়ি বছর ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম করে পট এঁকে , মেলায় মেলায় পটের 'স্টল' দিয়ে ,গ্রামে গ্রামে পট প্রদর্শন করে অবস্থা ফিরিয়েছেন । এখন নয়ার পটুয়াদের মধ্যে সবচেয়ে অবস্থাপন্ন শ্যামসুন্দর চিত্রকর । একটি ছোটো পাকা বাড়ীও করেছেন । সবচেয়ে বড় কথা শ্যামসুন্দরের ভদ্র ব্যবহার ও পটের প্রতি নিষ্ঠা। যে কোন অতিথি বাড়ীতে গেলেই তাকে সাদরে আপ্যায়ন করেন। শ্যামসুন্দরের সহায়তায় নয়াগ্রামের মহিলারা ' পটুয়া মহিলা জনকল্যাণ উন্নয়ন সমিতি' গড়েছেন। এই সমিতির সদস্য সংখ্যা পনের । এঁদের মধ্যে যমুনা চিত্রকর (৩৬) ,করুণা চিত্রকর (৩৫) , মণিমালা চিত্রকর (৩০) , রাধা চিত্রকর (৩৪) , রূপবান চিত্রকর (৩৩) , ময়না চিত্রকর (২২) - প্রমুখ উল্লেখযোগ্য । এঁরা অঙ্কিত পটগুলি সমিতিতে রাখেন । সেখান থেকেই পট বিক্রয়ের ব্যবস্থা রয়েছে। স্থানীয় ব্যাঙ্কে এই সমিতির পাশবই রয়েছে । এই সমিতির সদস্যরা অভাবের সময় পাঁচশ টাকা পর্যন্ত এখান থেকে লোন পেতে পারেন ।

পটুয়া সমিতির কাজকর্ম ছাড়াও রাণীর খ্যাতি বিশ্বময় । ইতিমধ্যে রাণী লন্ডন ঘুরে এসেছেন। তাঁর হাতে আঁকা পট জাপান , জার্মান ও ফ্রান্সে গিয়েছে। বৎসরান্তে বিদেশিনী মারকোস ও রেগিনা এঁদের বাড়ীতে আসেন। মাসাধিক কাল শ্যামসুন্দরের বাড়ীতে অবস্থান করেন। রাণী ও শ্যামসুন্দরের কণ্ঠে গীত পটুয়াসংগীত রেকর্ড করেন। মনসামঙ্গল , চণ্ডীমঙ্গল , নিমাইসন্ন্যাস ,কৃষ্ণলীলা , বধূহত্যা , বৃক্ষরোপণ, সাক্ষরতা , পরিবেশ সচেতনতা , পরিবার পরিকল্পনা , মহারাষ্ট্রের ভূমিকম্প, ফরাসী বিপ্লব , কলকাতা ৩০০ ইত্যাদি অসংখ্য পট এঁরা শ্যামসুন্দর- রাণীর কাছ থেকে কিনে বিদেশে নিয়ে গিয়েছেন । মূলতঃ এঁদের আর্থিক সহায়তায় শ্যামসুন্দরের একমাত্র মেয়ে সুষমা মালিগ্রাম হাইস্কুলে এখন সপ্তম শ্রেণীতে পড়াশুনা করে ।

শ্যামসুন্দর ও রাণী উভয়েই এখন তসর , সিল্কের শাড়ীতে পটের ছবি আঁকেন। শাড়ীগুলির আঁচল ও পাড়েই বেশী ছবি আঁকা হয়। চিত্ররীতি পটের মতই । তবে অবশ্যই শাড়ীতে আগে স্কেচ করে নেন রাণী। একটা সম্পূর্ণ শাড়ীতে পটের ছবি ফেব্রিক রঙে ভরাতে প্রায় দশ দিন কাজ করতে হয়। গঙ্গা মান্নার মত রাণীও হয়তো এমন করেই পটুয়ার শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখবেন।

দুখুশ্যাম চিত্রকর ঃ

নয়াগ্রামে পটুয়াদের মধ্যে যে মানুষটিকে সবাই একবাক্যে গুরুজ্ঞানে সম্মান করেন তিনিই দুখুশ্যাম চিত্রকর। আঁকা অপেক্ষা বরাবর দুখুশ্যাম পটুয়াসংগীত পরিবেশনেই পারদর্শী। রাণী , শ্যামসুন্দর , যমুনা, করুণা- এরা প্রত্যেকেই দুখুশ্যামের হাতে গড়া ছাত্র ছাত্রী। শুধু পটের আদি সুর নয় বিভিন্ন প্রচলিত সংগীতের সুরে এমনকি আধুনিক গানের সুরেও অনায়াস দক্ষতায় দুখুশ্যাম পটুয়াসংগীত পরিবেশন করতে পারেন। শুধু পটুয়াসংগীত পরিবেশন নয় , মেদিনীপুরে প্রথম পাঁচজন পটুয়াসংগীত রচয়িতাদেরমধ্যে দুখুশ্যাম একজন । বাকীরা হলেন হবিচকের নিরঞ্জন চিত্রকর , পিয়ারী চিত্রকর , মালিগ্রামের হরেন চিত্রকর এবং ঠেকুয়াচকের অজিত চিত্রকর । দুখুশ্যামের ধুমপানে প্রবল নেশা । চিত্রপরিচালক সুপ্রিয় সেন দুখুশ্যামকে নিয়ে একটি ছাব্বিশ মিনিটের তথ্যচিত্র তৈরী করেছেন । ১৯৯৭ সালে তৈরী এই ছবিটির নাম " The Dream of Hanif " কিন্তু এই ছবিতে পটুয়াদের হারমোনিয়াম নিয়ে পটের গান রেওয়াজ করার যে দৃশ্য রয়েছে তা আরোপিত। নয়াতে কেন , পশ্চিমবঙ্গের কোথাও (একমাত্র বাঁকুড়ার বাঁকু চিত্রকরকে বাদ দিলে) পটুয়ারা রেওয়াজ করেন না। সে যাই হোক, দুখুশ্যামের আদি বাড়ি ছিল আকবপুর। নয়া তাঁর মামার বাড়ি। পট আঁকা শিখেছেন বড়মামা গুণধর চাপড়ীর কাছে। কালীঘাটের পটুয়ারা দুখুশ্যামের 'বাবারদিক' বলে জানান দুখুশ্যাম। তিনি একাধিকবার পট বিষয়ক বিভিন্ন কর্মশালায় নতুবা শিক্ষণ শিবিরে অংশগ্রহণ করেছেন । তবে গুরু হওয়ার কারণে বোধকরি তার মেজাজ বেশী। রাশভারী , রক্তাভ বর্ণের চোখ , কাঁচাপাকা গোঁফ দাড়ির এই মানুষটি পট কিংবা পটুয়া নিয়ে কোন উত্তর দেবার আগেই টাকার অঙ্ক বুঝে নিতে চান । তবে কখনোই প্রশ্ন কর্তাকে তিনি নিরাশ করেন না। একের পর এক পটুয়াসংগীত শুনিয়ে , গল্প করে মন ভরিয়ে দেন।

দুখুশ্যামের সঙ্গে কথা বলে পট-পটুয়া নিয়ে তাঁর ক্ষোভের কথা শোনা যায়। পট - পটুয়ার উন্নয়ন নিয়ে তাঁর ভাবনা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ । পট - পটুয়ার পুনরুজ্জীবনের প্রশ্নে তাঁর প্রস্তাবগুলি নীচে পরপর সাজিয়ে দিলাম --

১। সরকারী প্রচারের কাজে পটকে মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করতে হবে । পটুয়াদেরকে গ্রামের লোক চেনে , বিশ্বাস করে । আর পটের মাধ্যমে সরকারী বার্তা শোনালে সহজেই গ্রামের মানুষ মেনে নেবেন । যেমন --সাক্ষরতা , পরিবার পরিকল্পনা , এইড্‌স , পালস্ পোলিও কর্মসূচীতে এঁরা অনায়াসেই অংশগ্রহণ করতে পারেন ।

২. পটের স্কুল খুলতে হবে । পট আঁকা , গান রচনা করা শেখাতে হবে নতুন প্রজন্মকে ।

৩। পটুয়া শিল্পীদের মাসিক ভাতা দিতে হবে ।

৪। পট বিক্রির জন্য সরকারী কেন্দ্র খুলতে হবে ।

৫. পটুয়াদের নিয়ে আরও বেশী ওয়ার্কশপ হওয়া জরুরী ।

নিরঞ্জন চিত্রকর ঃ

পূর্ব মেদিনীপুরের চণ্ডীপুর থানার হবিচক , নানকারচক ও মুরাদপুরে প্রায় পঞ্চাশটি পটুয়া পরিবার বসবাস করেন। হেঁড়িয়া থেকে হাঁসচড়া সেতুর বাম দিকের খালপাড় ধরে উত্তরে এগুলেই পটুয়াপাড়ার শুরুতেই নিরঞ্জন চিত্রকরের বাড়ি। নিরঞ্জন ' পটলিখা' তে যেমন দক্ষ, পটুয়াসংগীত রচনাতেও সিদ্ধহস্ত । নিরঞ্জন চিত্রকরের (৫০) পটে হাতে খড়ি পিতা মথন চিত্রকরের কাছে । স্ত্রী ঝর্ণা চিত্রকর (বরকত), দুই ছেলের মধ্যে বড় তপন , অন্য নাম আবুবকর (২৬) বাবার কাছে 'পটলিখা' শিখেছেন। তপনের আঁকা পটের সুনাম আছে বাজারে। পট আঁকা ও পট প্রদর্শন তাঁর মূল জীবিকা। ছোটো স্বপন চিত্রকর তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনা করেছে । কিন্তু পিতৃপুরুষের ঐতিহ্যলালিত 'পটলিখা'-তে তাঁর কোন আগ্রহ নেই। টেলারিং এর কাজ শিখেছেন স্বপন। মাসিক আয় ১২০০ টাকার মত ।

নিরঞ্জন ও তাঁর স্ত্রী ঝর্ণা একসঙ্গে নানান ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণ করেছেন । পেয়েছেন একাধিকবার পুরস্কার। তাঁর লেখা ফরাসী বিপ্লব , জাহাজে নগেন বাবুর খুন , সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি , তমলুকের জাতীয় সরকার ইত্যাদি পটুয়াসংগীত সুবিখ্যাত । এছাড়াও রবীন্দ্রনাথ , সাক্ষরতা , বৃক্ষরোপণ, জলসংরক্ষণ , শাউড়ী - বৌয়ের ঝগড়া ,মহারাষ্ট্রের ভূমিকম্প , দেঁড়া মাছের বিয়ে , ইন্দিরা গান্ধী , রাজীব গান্ধী ইত্যাদি অসংখ্য পটুয়াসংগীত রচনা করেছেন নিরঞ্জন চিত্রকর। ডঃ সুহৃদ ভৌমিক এঁকে মাঝেমধ্যেই পট আঁকার বায়না দেন । নির্দেশ দেন "পট চলমান চিত্র , তাই জড়ানো পট চৌকো চৌকো প্যানেলে আঁকা হবে না ; শুধু দুদিকের বর্ডারে নক্সা হবে এবং পরপর ছবি আঁকা হবে "। নির্দেশ মত নিরঞ্জনও পট এঁকে দেন। বিদেশীরা বাড়ীতে এলে বা শহরে মেলায় গেলে সাধারণত পট বিক্রি হয় বলে জানালেন । জড়ানো মাঝারী পটের দাম চারশ থেকে পাঁচশ টাকা। চৌকো পট বেশী বিক্রী হয় । ইদানীং নিরঞ্জন চিত্রকর প্রতি বছরই বেশ কিছু গ্রিটিংস্ কার্ড তৈরী করেন। বিষয় থাকে ফুটন্ত গোলাপ , দুই পাখি , সাদা উড়ন্ত হাঁস , নৃত্যরত ময়ূর , উড়ন্ত সাদা বক , রাধাকৃষ্ণ ইত্যাদি । তাঁর মতে সাপুড়ের গানের সুর এবং বাউল , ঝুমুর ইত্যাদি গানের সুরও পটের সুরে এসে মিশেছে ।

মুরগী - ছাগল ইত্যাদি গৃহপালিত পশুপালনের মাধ্যমেও নিরঞ্জনের কিছুটা আর্থিক সুরাহা হয়। 'তমলুকের জাতীয় সরকার' গঠনের পটুয়াসংগীত রচনাতে পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন সুশীল ধাড়া মহাশয় । তমলুকের জাতীয় সরকার গঠনের ইতিহাসে এঁনার নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে — নিরঞ্জনের বক্তব্য এমনই । সাংসারিক অভাব অনটনে পড়েও পট ছাড়তে পারেননি । বরং নতুন উৎসাহে বড় ছেলেকেও এই জীবিকাতে টেনে নিয়ে এসেছেন । বছর দুই আগে হবিচকে একটি পটুয়া স্কুল গড়েছিলেন । অর্থাভাবে তা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তবু নিরঞ্জন আশা ছাড়েন নি । তাঁর মতে পটশিল্পী তৈরী করতে হবে । ভালো পটের কদর থাকবেই চিরদিন । তাই নতুন শিল্পীদের শিক্ষা দেওয়ার পাশাপাশি দীর্ঘ অনুশীলন বা অভ্যাসের জন্য সরকারকে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে । তাহলেই বাঁচবে পট , বাঁচবে পটুয়া ।

গৌরী চিত্রকর ঃ

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার দাসপুর থানার চন্দ্রেশ্বর খালের ধারে নির্ভয়পুর গ্রামের পটুয়াপাড়া। এখানেই বসবাস করেন গৌরী চিত্রকর (৭৩)। ইনি একজন সফল পটশিল্পী । প্রথম মহিলা পটুয়া হিসাবে ১৯৮৫ সালে নরমেধ যজ্ঞের পট ' লিখে ' ইনি রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পেয়েছিলেন। পটুয়াপাড়ার মহিলারা যে কোন অংশে পিছিয়ে নেই তার প্রমাণ গৌরী — একমাত্র রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপক ।

গৌরী জানালেন তাঁর পিতা জ্যোতিন্দ্র চিত্রকরের কথা। পিতা ছিলেন এক প্রখ্যাত পটশিল্পী । যেমন তাঁর ছিল আঁকার হাত তেমনি কণ্ঠে ছিল সুর । পট প্রদর্শন করাই ছিল তাঁর জীবিকা। মাত্র দশ বছর বয়সে পিতার কাছেই গৌরীর হাতেখড়ি । তারপর থেকে পট এঁকে চলেছেন । আজও বিরাম নেই । জীবন সায়াহ্নে পৌঁছেও তুলির সুনিপুণ টানে ফুটিয়ে তুলছেন বলিষ্ঠ , স্বতঃস্ফূর্ত ও প্রাঞ্জল ছবি । এই গ্রামের মিহির চিত্রকরের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয় চৌদ্দ বৎসর বয়সে। গৌরীর তিন পুত্র— কানন, ভাটু ও মন্টু । এঁদের মধ্যে বড় কানন চিত্রকর নাড়াজোলে বসবাস করেন। কাননের হাতের আঁচড় বেশ ভাল । গৌরীর অন্য দুই ছেলে পটের গান দু - একটি জানলেও তেমন আঁকতে পারেন না । গৌরীর মেয়েও তিনটি - ভাদরী , মালিকা ও ময়না । এঁদের মধ্যে ময়না ইতিমধ্যেই মহিলা চিত্রকর হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ।

ভারতবর্ষের নানা প্রান্তে পট নিয়ে ঘুরেছেন গৌরী । দু'টি রাজ্য পুরস্কারও তাঁর দখলে । তাঁরপ্রিয় পটগুলি হল — মনসার ভাসান, দাতাকর্ণ , নরমেধযজ্ঞ , নিমাইসন্ন্যাস , সত্যপীর , হরিশ্চন্দ্র , দুর্গাপট, কৃষ্ণলীলা, বস্ত্রহরণ ইত্যাদি । পিতা যতীন্দ্রের মতই গৌরীর পটে সূক্ষ্ম কাজ । রাষ্ট্রপতি জ্ঞানী জৈল সিং এর সময় ১৮৮৫ তে নরমেধ যজ্ঞের পট ' লিখে ' রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পেয়েছিলেন। রাষ্ট্রপতির প্রদত্ত প্রশংসিকাটি এইরূপ —

PATA CHITRA (Scroll Painting)

Smt. Gouri Chitrakar

B.1940, West Bengal.

Hailing from an illustrious family of traditional Pata Painter Smt. Gouri Chitrakar Received her initial training from her mother when she was quite young with her vast experience of twenty five years Smt. Chitrakar has participated in many state and national level competetions to show her skill and craftsmanship in traditional theme bledind with modern ideas and ideologies . She has rightly chosen her son to continue the traditional scroll Painting and singing songs for keeping the performing art alive . As a renowned folk painter she performing art alive .As a renowned folk painter she has received district and state level a words from 1983 of wards at a stretoch a part from the crafts musuam , New Delhi . Smt. Gouri Chitrakar receivs the National Award for master crafts Persons for her excellence in traditional Pata Painting .

পটশিল্পী হিসাবে সাফল্যের শীর্ষস্থানে পৌঁছালেও দারিদ্র্যের কবল থেকে গৌরী মুক্ত হতে পারেন নি। রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পাওয়ার পর সরকারী সাহায্যে একটি পটুয়া স্কুল খুলেছিলেন। মাসে সাতশ পঞ্চাশ টাকা মাসিক বেতন পেতেন। অবসরের পর পাঁচশ টাকা মাসিক ভাতা পেতেন। কিন্তু প্রায় পাঁচ বছর হল সেই ভাতাও বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ইন্দিরা আবাস প্রকল্পে একটি ছোটো ইঁটের বাড়ী আর পাঁচ কাঠা কৃষিজমি তাঁর সম্বল। বাইরে এখন আর কোথাও যেতে পারেন না। তাই ঘরে বসেই ছোটো ছোটো নাতি নাতনিদের পট অংকনের শিক্ষা দিচ্ছেন। পট নিয়ে এই প্রাচীনার বক্তব্য অনেক , রয়েছে নানা ক্ষোভ , অভিযোগ। তা সত্ত্বেও এই প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি তাঁর মমত্ববোধ প্রকাশিত হয়। পট নিয়ে তাঁর ভাবনা- চিন্তা সমন্বিত নানা প্রস্তাবকে নীচে পরপর সাজিয়ে দেওয়া হল --

১। পট জাতীয় সম্পদ। তাই একে রক্ষা করতে গেলে পটশিল্পীকে আগে বাঁচাতে হবে । বয়স্ক শিল্পীদের মাসিক ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে ।

২। পটুয়া স্কুল খুলে স্থায়ীভাবে পটুয়া শিক্ষক নিয়োগকরতে হবে। ছাত্র-ছাত্রীদের ভরণ পোষণের দায়িত্ব সরকারকেই নিতে হবে ।

৩। শহরে স্থায়ী পট প্রদর্শন কেন্দ্র তৈরী করতে হবে । পট বিক্রীর ব্যাপারটা সরকার নিয়ন্ত্রণ করলে ভালো হয় । এতে পটুয়া প্রতারিত হবে না বলে তাঁর বিশ্বাস ।

৪। পটের বিষয় সম্পর্কে সকলকে সচেতন হতে হবে । তাঁর মতে -'আধুনিক-সামাজিক পট আঁকা ঠিক নয় '। তাঁর কথায় " সামাজিক পট , পট নয় । আমরা পূর্বপুরুষের কাছ থেকে পৌরাণিক পট আঁকা শিখেছি , আমরা লেখাপড়া জানি না , আধুনিককালের সমস্যা গুলির ব্যাপারে বিশেষ জ্ঞান নেই। তাই প্রকৃতিদত্ত পৌরাণিক পটই পটুয়াকে ধরে রাখতে হবে " ।